—:০:—

যোগের উদ্দেশ্য

যোগের ফল মুক্তি, তোমরা চিরকাল এই কথাটি শুনিয়া আসিতেছ। আমি যে পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি তোমরাও যদি সেই পন্থায় চলিতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে মুক্তি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা একটু বদলাইতে হইবে। আমি মুক্তি অর্থে 'লয়' বুঝি না। লয়কে অন্বেষণ করা উচিত নয়, তাহার প্রার্থনা করাও উচিত নয়। ভগবানের "যখন ইচ্ছা হইবে, এইভাবে শুধু তাহার অপেক্ষা করা উচিত। গোড়া হইতে যদি লয়কেই তোমার লক্ষ্য বলিয়া ধর তবে আত্মার পরিণামকে তুমি খণ্ডীকৃত করিয়া লইতেছ, ভগবানের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে তোমার ইচ্ছারই প্রতিষ্ঠা করিতেছ। প্রকৃত-পক্ষে মুক্তি অর্থে অজ্ঞান হইতে মুক্তি, অহংকার হইতে মুক্তি, সকল দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি। তারপর মনে রাখিও মুক্তিই যোগের একমাত্র বা শেষ কথা নয়। যোগের চারিটি পর্ব্ব বা অঙ্গ—মুক্তি তাহার একটি। এই চারিটি অঙ্গ হইতেছে—১। শুদ্ধি, ২। মুক্তি, ৩। ভুক্তি, ৪। সিদ্ধি। শুদ্ধি ও মুক্তি যোগের প্রথমপাদ মাত্র। উদ্দেশ্য ক্ষেত্রটিকে উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া তোলা, কিন্তু যোগের পূর্ণ সার্থকতা ভুক্তি ও সিদ্ধি লইয়া। সমস্ত পুরাতন অভ্যাস, গতানুগতিক অন্ধসংস্কার হইতে অব্যাহতি লাভ

করিতে হইবে। কিন্তু কি জন্য ? অন্য প্রকার অভ্যাস, অন্য প্রকার সংস্কার —ভগবৎ-প্রেরণার যে অভ্যাস, যে সংস্কার, তাহাতেই পরিপূরিত হইবার জন্য। মানুষভাব হইতে মুক্ত হও, দেবভাব পাইবার জন্য। ত্যাগের দ্বারা ভোগকেই চিনিয়া লইও—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। আর জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে, প্রেমে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে তুমি যখন পূর্ণ, ভগবানেরই ন্যায় তুমি অন্তরে যখন স্বরাট্, বাহিরে যখন সম্রাট্ তখনই তোমার যোগের সিদ্ধি।

এই কথাটিই তোমাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। যে মূল ভাবটি আমার যোগকে পরিচালিত করিয়াছে সে ভাবে তোমরা অনেকেই ঠিক অভ্যস্ত নও। বৈরাগ্যকেই যদি তোমরা সকল জ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ বলিয়া মনে কর তবে আমার শাস্ত্রে তোমাদের তৃপ্তি হইবে না। বৈরাগ্য সনাতন ভাব নহে। আমি ত মনে করি বৈরাগ্য মনের একটি সাময়িক অবস্থামাত্র। সাধনার একটি বিশেষ পর্য্যায়েই ইহার প্রয়োজনীয়তা। যখন কোন পুরাতন দৃঢমূল সংস্কারকে কেবল অভ্যাস বা চেষ্টা দ্বারা দূর করা যায় না, ভগবান্ তখন এই বৈরাগ্যকে জাগরিত করিয়া সেই সংস্কারের নিরসন করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত চিত্ত কিছুতেই নিশ্চল হয় না, মন কোনরূপে শান্ত হয় না, সে পর্য্যন্ত এই চাঞ্চল্য, এই অশান্তি—জ্ঞানকে, ভগবৎ-প্রেরণাকে সর্ব্বদাই বাধা দিতে থাকে, ইহাকে অপ্রতিহতভাবে কার্য্যকরী হইতে দেয় না। এবং তখনই হয় অভ্যাস, না হয় বৈরাগ্য দ্বারা এই বন্ধন কাটাইতে হয়। কিন্তু মন যখন স্থির হইতে শিখে, বিষয়ের সম্পর্কে আসিলে যখন উহার মধ্যে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারের আন্দোলন আর খেলে না, তখন জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে ; শক্তি স্বপ্রেরণাবশেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন তোমাদের আর প্রকৃতপক্ষে কোন সাধন নাই, আছে কেবল সিদ্ধির ক্রমবর্দ্ধনশীল বিকাশ। সে সিদ্ধি কোন পূর্ব্বকল্পিত বা স্থিরনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে

না। প্রকৃতির যে সহজসিদ্ধ নিয়মবশে মানুষ চলা ফেরা করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে সেই স্বতঃস্ফুরিত নিয়মবশেই তোমাদের যোগ নিয়মিত, পরিচালিত হইবে, প্রকৃতির অন্তঃস্থ অদম্য শক্তি বলেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। চেষ্টাসাধ্য অভ্যাসেরই বা তখন প্রয়োজন কি, বৈরাগ্য-বিমুখতারই বা সার্থকতা কি ? সব রকম আসক্তিই পরিত্যাগ করিবে। বৈরাগ্যের প্রতি যে আসক্তি সেও আসক্তি। লোভ যেমন পরিবর্জ্জনীয়, বৈরাগ্যও তেমনি পরিবর্জ্জনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে, অবস্থাবিশেষে উভয়ই প্রয়োজনীয় আবার উভয়ই অনিষ্টকর।

আবার যদি তুমি বৌদ্ধভাবের ভাবুক হইয়া বল যে জগৎ অর্থই দুঃখ, কোন না কোন রকম অবসান বা নির্ব্বাণই পরম পুরুষার্থ অথবা মায়াবাদী-দিগের সহিত একমত হইয়া বলিতে থাক যে জগৎ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই আমরা জগতে আসিয়াছি, তবে আমি তোমাদিগকে আবার বলি আমার পন্থা তোমাদিগের জন্য নহে, অন্যত্র তোমরা দীক্ষালাভ কর। আমি বৈদান্তিক বটে কিন্তু ততোধিক তান্ত্রিক। আমি জানি এই জগৎ আনন্দ হইতেই উদ্ভূত, আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত, আনন্দ হইতে আনন্দেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। বৈদিক দ্রষ্টাদিগের জ্ঞানই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। আনন্দ ও শক্তি এই দুইটি সত্যের উপরই সকল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। দুঃখ ও দৌর্ব্বল্য উহাদের বিকার মাত্র। তাহার মূল অজ্ঞান। যে মহতে, যে সত্যম্ ঋতম্ বৃহতে আমাদের প্রকৃত সত্তা তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, অজ্ঞান আসিয়া তাহাকে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আমি জানি বিকার বিকার মাত্র, শাশ্বত নহে, সঙ্কীর্ণ দেশ কালেই আবদ্ধ ও ততটুকু হিসাবে সত্য। উহার বিকাশ এই কলিযুগেই, উহার লীলা প্রধানতঃ আমাদের এই পৃথিবীতেই। এই দুঃখ ও দৌর্ব্বল্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে হইবে, দেশের ও কালের যে সঙ্কীর্ণ কোণটুকুতে তাহারা আশ্রয়

লইয়াছে তাহা হইতেও উহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ব্যক্তিগত হিতার্থে, মানবজাতির হিতার্থে এই পৃথিবীর উপর দেবলোকেরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, কলির অবসান করিয়া সত্যযুগকেই স্থাপনা করিতে হইবে। যে মতবাদ জগৎকে দুঃখময়ই বলিয়া জানে, মানুষকে সকল কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া জগৎ হইতে বিমুখ হইতে বলে, মানুষকে শিখায় যে নৈষ্কর্ম্ম্য ও বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র পন্থা, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আমি তাহাতে অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করি না। ভগবান্ স্বয়ং মঙ্গলময় দোষদ্বেষহীন, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার রূপ এই যে সৃষ্টি তাহা কেবল অমঙ্গলেরই নিদান, সকল দোষেরই বাসস্থান—এ কোন্ যুক্তি, এ কোন্ জ্ঞান আমি বুঝিয়া পাই না। আমি কথনই স্বীকার করিব না, জীবন একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন, শূন্যগর্ভ মৃগতৃষ্ণিকামাত্র। এ জ্ঞান আমি বৈদিক ঋষিদিগের মুখ হইতে পাই না। আমার নিজের উপলব্ধির সহিতও ইহার কোন সাদৃশ্য দেখি না। আমার নিজের উপলব্ধি প্রতিপদেই আমাকে দেখাইয়া চলিয়াছে সৃষ্টি কি মহৎ সত্য, কি শাশ্বত আনন্দে ইহার প্রতিষ্ঠা, কি পরাজ্ঞানে ইহা সদা বিধৃত। আমার উপলব্ধি আমাকে সতত শিক্ষা দিয়াছে সৃষ্টির এই বিরাট কর্ম্মস্রোতের মধ্যেই থাকিতে, আপনার কর্ম্ম-প্রেরণাসকলকে কেবল বাসনানির্ম্মুক্ত করিয়া নিখিল কর্ম্মসাগরেই মিশাইয়া দিতে; কর্ম্মের প্রেরণাকে নষ্ট করিতে সে বলে নাই। বস্তুতঃ আসক্তিহীন কর্ম্মী—গীতার 'নিষ্কাম কর্ম্মী'—যে জ্ঞানে উদ্ভাসিত, যে আনন্দে পরিপ্লুত, যে পূর্ণতার আধার, সে জ্ঞান, সে আনন্দ, সে পূর্ণতা কর্ম্মত্যাগী উদাসীন কোথায় পাইবে? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন,—

"জগতে কেহ বা কর্ম্ম শিক্ষা দেয়, কেহ বা নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয়, আমি কিন্তু যাহারা নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দেয় সে দুর্ব্বলচেতাদিগের মতাবলম্বী নহি"।

বিশ্বধারয়িতা দেবকুল যে ভাবে তাঁহাদের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সেই মহৎ আদর্শই আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। প্রাকৃতিক শক্তিসঙ্ঘের পশ্চাতে গ্যেতে (Goethe) যে আত্মপ্রতিষ্ঠ শান্তি, যে উদার ধৈর্য্য, যে শ্রান্তিহীন অটুট প্রেরণাবেগ সদা বিরাজমান দেখিতে পাইয়াছিলেন আমাদের কর্ম্মরাজিকেও ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার মতনই আমাদের কর্ম্মাবলী অবিরাম গতিতে ছুটিতে থাকিবে, স্বার্থ বা অহংকারের লেশমাত্র থাকিবে না, কুণ্ঠার ছায়াও তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

এই আদর্শটিকেই ভাল করিয়া বুঝিও। আবার, বলিও না "আমি অজ্ঞান, আমি বদ্ধ, আমার শক্তি নাই।" আমি ত জানি, আমি যে কখন অজ্ঞান কখন দুর্ব্বল কখন বদ্ধের ভাব দেখাই তাহা দেখাই মাত্র, খেলাটি জমাইয়া তুলিবার জন্য। এ সংসারনাট্যে অভিনেতাদিগের মত দুঃখভোগের অভিনয়ই করিতেছি, বাস্তবিক আমি দুঃখভোগ করি না। দুঃখও যে আনন্দের প্রকারভেদ তাহাই উপলব্ধি করি। ইচ্ছা করিলেই এ ভূমিকা ত্যাগ করিতে পারি। সে ত আমার উপর নির্ভর করে। কে বলে আমি অধম কীট, আমিই ত ব্রহ্ম। সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি। পাপ কোথায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে? কে বলে আমি পাপী, কোথায় আমার দুঃখ? আমিইত ভগবান, সমস্ত আনন্দই আমার মধ্যে বহমান। কে বলে আমি দুর্ব্বল? সেই অনন্তশক্তিমানের সহিত আমি একাত্মা। তিনি এক, তিনিই আবার বহুধা হইয়াছেন। তিনিই অনন্ত সমষ্টি, তিনিই ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে তিনি তবু অনন্তই রহিয়াছেন। সৃষ্টির ইহাই গুপ্ততত্ত্ব, ইহাই সেই উত্তমং রহস্যম্। এই সেই গুহাস্থিত অপূর্ব্ব তত্ত্ব, তর্ক যাহাকে খুঁজিয়া পায় না কিন্তু শ্রদ্ধাবানের দৃষ্টিতে যাহা স্বতঃ উদ্ভাসিত।

তোমার বৃহত্তর 'আমি', প্রকৃত 'আমি', এই 'তাঁহাকে' চিনিয়া লও। বাসনার খেলার মধ্যে মত্ত ও বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহাকে পাইবে না, আবার বৈরাগ্যের দ্বারা সকল বন্ধনের একান্ত পার হইয়া গেলেও তাঁহার সন্ধান মিলিবে না। বাসনাও চাই না বৈরাগ্যও চাইনা—আমি চাই আত্মসমর্পণ। বুঝিয়া লও তুমি একান্ত তোমারই নও। তোমার প্রকৃতি তোমার জাগতিক খেলা তাঁহারই ঈশ্বরভাব, তাঁহারই বিভূতি, তাঁহারই শ্রী। তোমা হইতে তোমাকে সরাইয়া ফেলিয়া তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠা কর। তোমার সব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার বুদ্ধির মধ্যে তাঁহারই সত্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠুক, হৃদয়ে তাঁহারই আনন্দ ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হউক, কর্ম্মপ্রেরণার মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছা কার্য্যকরী হউক আর তোমার শরীর তাঁহার এই সমস্ত লীলাভার বহন করিতে থাকুক। তাঁহারই ইঙ্গিতে কখন হও তুমি ঝঞ্ঝা বাত্যার ন্যায় রুদ্র, কখনও বা জ্যোৎস্নার ন্যায় হাস্যময়, কোথাও ভূমিকম্পের ন্যায় নির্ম্মম ধ্বংসকারী, কোথাও বা স্রোতস্বতীর ন্যায় কল্যাণময়ী। ভগবান্ যদি চাহেন, আকাশের মত বিরাট হইও আবার শিশিরকণাটির মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতেও কুণ্ঠিত হইও না। বাহিরে এই অনন্তমূর্ত্তি অনন্ত ভাব, এই নানাত্ব, এই বৈচিত্র্য কিন্তু অন্তরে সদা নিশ্চল শান্তি, প্রসন্ন বিমলতা, তাঁহারই সমাধিমগ্ন নিথর আত্মপ্রতিষ্ঠা—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য।